Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501005 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Thematic Considerations in Bengali Children's and Juvenile Literature: In the Light of Diverse Perspectives

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিষয় ভাবনা: বিচিত্র ভাবনার আলোকে

Puja Mondal
Researcher
Bengali Department
Kalyani University

Received on: 06th February 2026
Accepted on: 09th March 2026

Abstract:

Children's literature may be defined as a literary domain structured around the cognitive, affective, and imaginative frameworks of the child psyche, necessitating a nuanced and developmentally attuned selection of themes. Although childhood and adolescence constitute contiguous developmental phases, their epistemic orientations and aesthetic expectations diverge: children typically respond to rhythmic, fantastical, and orally inflected forms, whereas adolescents demonstrate a preference for knowledge-oriented, adventure-driven, and suspense-based narratives. While certain authors preserve this categorical distinction, others adopt an integrative compositional strategy that accommodates the sensibilities of both cohorts, thereby constituting a hybridized corpus of children's and young adult literature. Given that young readers lack fully institutionalized evaluative criteria, the authorial function assumes heightened ethical and pedagogical responsibility.

Accordingly, thematic curation emerges as a critical determinant: texts must be accessible, affectively engaging, and stylistically moderated through levity and humour, while avoiding excessive discursive density. Simultaneously, such literature must extend beyond mere entertainment to facilitate cognitive enrichment and the cultivation of socio-cultural and environmental consciousness. This paper foregrounds the key parameters governing thematic selection in children's literature.

Key Words:

Children's and Adolescent Literature; Characteristics of the Child and Adolescent Mind; The Nature of Children's and Adolescent Literature; Thematic Conceptualization.

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ শাখা হলো শিশুসাহিত্য। আজকের শিশুই হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের সুনাগরিক। সাহিত্যের যে শাখাটিতে তাদের মনের জগৎটি পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাকে শিশুসাহিত্যরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরিণতমনস্ক মানুষের মনের নানান বৈচিত্র্য ও গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন সাহিত্যিকের কলমে বিভিন্নভাবে ভাষারূপ পেয়েছে। কিন্তু শিশুমনের হদিশ, তার মনোজগতের নানান গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। এই কাজটি যিনি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন তিনিই প্রকৃত শিশুসাহিত্যিক। পরিণতবয়স্ক ও পরিণতমনস্ক মানুষের মনের জগতে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা গেলেও একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুরই মনের গঠন প্রায় একইরকম থাকে। এরপর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মনের জগতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মানুষের জীবনের একেবারে প্রথম অবস্থাটির নাম শৈশব। এই শৈশবই কালক্রমে কৈশোর, কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়। তাই মানুষের জীবনে এই শৈশব ও কৈশোরকাল ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর ভবিষ্যতের পরিপূর্ণতার বীজ তার শৈশব ও কৈশোরকালীন সময়টিতেই রোপিত হয়। খুব ছোটোবেলায় বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে নানান গল্প, ছড়া, কবিতা, রূপকথা ইত্যাদি শুনতে শুনতে তার মন সুদূর কল্পনায় পাড়ি দিতে শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনাশক্তি আরো সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে এবং আরো নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এভাবেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে ভাষাজ্ঞান ও রসবোধ।

শিশুসাহিত্য কাকে বলা হবে, একটি সাহিত্যের মধ্যে কী কী গুণাবলি থাকলে সেই সাহিত্য শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারবে অর্থাৎ শিশুসাহিত্যের যথার্থ সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের অবসান আজও ঘটেনি। মনস্তাত্ত্বিকদের একাংশ মনে করেন, শিশুমনের প্রকৃত স্বরূপ যতদিন না উন্মোচিত হবে, যতদিন না তার মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করার চাবিকাঠির হদিশ পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত তাকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। শিশুর ভাষায় ঠিক শিশুর মতো করে সাহিত্য রচনা করা দুরূহ কাজ:

"আমাদের পরিপক্ক ভাষার সাহায্যে শিশুর কোমল মনে কোনরকম রেখাপাত করা কোন দিন সম্ভব হবে না। সত্যিকারের শিশুসাহিত্য গড়তে হলে শিশুর শব্দভাণ্ডার জানতে হবে, তার ভাষাবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মনোজগতে কী কী পরিবর্তন ঘটে, তা লক্ষ্য করতে হবে — এক কথায় শিশুজীবনে ভাষা বিকাশের ধারাটিকে শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে আমাদের।"[১]

শিশুরা কী পড়বে, কতটুকু পড়বে তার মানদণ্ড তৈরি করে দেন বড়োরা। কিন্তু সাহিত্যের রস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে কখনোই কারো বশবর্তী থাকেনা, এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই এই খুদে পাঠকদের খুশি করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বৌদ্ধিক দিক থেকে তার বিকাশ পরিপূর্ণভাবে না ঘটলেও এক সহজাত উপলব্ধির দ্বারা সে তার মতো করে ঠিক ভুলের মাপকাঠি ঠিক করে নেয়।

শিশুদের জন্য রচিত যাবতীয় সাহিত্যকেই শিশুসাহিত্য বলা হয়। ইংরেজিতে যে সাহিত্য জুভেনাইল লিটারেচার নামে পরিচিত, বাংলায় তাকেই মূলত শিশুসাহিত্য বলা হয়। কিশোরসাহিত্যকেও অনেকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আবার অনেকেই 'শিশুসাহিত্য' ও 'কিশোরসাহিত্য'কে পৃথক করে দেখার পক্ষপাতী। মূলত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে বিশুদ্ধভাবে শিশুসেব্য রচনাগুলির আওতায় সাবালকসেব্য বিভিন্ন রচনা প্রবেশ করার প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায়। সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখাকে আলাদা করে 'শিশুসাহিত্য' বা 'কিশোরসাহিত্য' বলার কারণ সচেতনভাবে এর পাঠকশ্রেণির দিকে ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ এই বিশেষ সাহিত্যধারার ভোক্তা কারা হবে সেইদিকে লেখকদের সচেতন দৃষ্টি থাকে। একথা ঠিক যে শিশু ও কিশোরদের কথা ভেবে শিশু ও কিশোরসাহিত্য রচনা করা হলেও বয়স্ক পাঠকদের জন্য রচিত সাহিত্যকে কিন্তু 'বয়স্কসাহিত্য' বলা হয় না। তাই সাহিত্যের একেবারে শুরুতেই 'শিশু' কিংবা 'কিশোর' এই বিশেষ শব্দবন্ধগুলি প্রয়োগ করার কারণ হলো এই সাহিত্য একান্তভাবেই শিশু ও কিশোরদের উপযোগী।

'শিশু' এবং 'কিশোর' এই শব্দদুটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই পরিভাষা দুটি আলাদা আলাদা দুটি বয়সের কথা বলছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ছোটোদের জন্য লেখা সব ধরনের সাহিত্যকেই 'শিশুসাহিত্য' বলা হয়। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে এই সাহিত্যগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যে 'শিশুসাহিত্য' ও 'কিশোরসাহিত্য' যথাক্রমে 'Child Literature' এবং 'Juvenile Literature' নামে পরিচিত। কিন্তু বাংলায় এই স্তরবিভাগটিকে প্রায়শই মানা হয় না। ছোটোদের উদ্দেশ্যে লেখা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের সময় বাণী বসু (১৯৩৯) বইটির ইংরেজি শিরোনামে লিখেছেন 'A BIBLIOGRAPHY OF BENGALI BOOKS FOR CHILD

© Santiniketan Sahityapath

AND YOUNG ADULTS'। এখানে 'YOUNG ADULTS' শব্দটি লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ কিশোরদের জন্য লিখিত সাহিত্যকেও শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুসাহিত্যের একটি সামগ্রিক ইতিহাসকে লিপিবন্ধ করতে গিয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬-১৯৭৮) তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য' (১৯৫৮)। কিন্তু এই গ্রন্থে যেসব বই এবং পত্রপত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলিকে শিশুসাহিত্য না বলে কিশোরসাহিত্য বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আবার আশা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২২-১৯৮৭) রচিত 'শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' (১৩৬৬) গ্রন্থটিরও বেশিরভাগ বক্তব্য কিশোরদের জন্য। লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), নবেন্দু সেন (১৯৪৪-২০০৮) প্রমুখরাও সমগ্রভাবে ছোটোদের জন্য রচিত সাহিত্যকেই শিশুসাহিত্য বলার পক্ষে।

কিন্তু রসগ্রহণের প্রসঙ্গ আসলেই বোঝা যায় যে বিষয়দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এ বিষয়ে নানাজনের নানা মত প্রচলিত। আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে — "শিশুসাহিত্য" বলিতে এখানে আমাদের গণ্ডী কৈশোর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।"[২] আবার শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট আলোচক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে — "আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকেই শিশু-সাহিত্য বলার পক্ষে।"[৩] যে শিশুর অক্ষর পরিচয় ঘটেছে, যে সামান্য হলেও লিখতে ও পড়তে সক্ষম এবং যে শিশুর এখনো অক্ষরপরিচয় আরম্ভ হয়নি, যারা কেবল শুনে শুনেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বোঝার ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা 'মুকুল'এর প্রস্তাবনায় সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) একটি নির্দিষ্ট বয়সের পাঠক পাঠিকার কথা বলেছেন — "মুকুল সম্পূর্ণরূপে ছোট শিশুদের জন্য নহে। যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭-র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য।"[৪] প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) মতে — "শিশুসাহিত্য বলে কোনো জিনিস আছে কিনা, যা বিশেষ করে শিশুদের জন্যই লেখা হয় তাকে সাহিত্য বলা চলে কিনা, এ বিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে; আমার মনে কিন্তু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিশুসাহিত্য বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারেনা। কেননা, শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের ওপর আর যে অত্যাচারই করুক-না কেন, সাহিত্যরচনা করে না।"[৫]

বিদেশে যে সাহিত্যকে 'চিলড্রেন লিটারেচার' বলা হয় তার সঙ্গে বাংলা 'শিশুসাহিত্য'কে মোটামুটিভাবে অভিন্ন বলেই মনে করা হয়। কিন্তু তাঁর মতে, "বিলেতে চিলড্রেনের সাহিত্য থাকতে পারে, এদেশে নেই; কেন-না, সে দেশের চাইল্ডের সঙ্গে এ দেশের শিশুর ঢের তফাত — বয়েসে। এ দেশে আর কিছু বাড়ুক আর না-বাড়ুক, বয়েস বাড়ে; আর সে এত তেড়ে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত সত্বর শৈশব অতিক্রম করে, পৃথিবীর অপর কোনো দেশে তত শীঘ্র করেনা... যে বয়েসে ইউরোপের মেয়েরা ছেলেখেলা করে, সেই বয়েসে আমাদের মেয়েরা ছেলে মানুষ করে। এবং সেই ছেলে যাতে শীঘ্র মানুষ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা শৈশবের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের বেশি দিইনে।"[৬]

তবে নিছক শিশুপাঠ্য না হলেও বালকপাঠ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন — "... শিশুসাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সংকল্প অতি সাধু। কেন-না, শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায় — অর্থাৎ আনন্দ — সেই বস্তু জুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি।"[৭]

'শিশু-কিশোর সাহিত্য'র নামকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় সেটি হলো, এই সাহিত্যের নামকরণ হয় মূলত উপভোক্তাদের দিক থেকে, রচনাকারের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ 'শিশুসাহিত্য' মানে শিশুদের দ্বারা লিখিত সাহিত্য নয়, শিশুদের জন্য লিখিত সাহিত্য। 'রবীন্দ্রসাহিত্য' বা 'শরৎসাহিত্য' বলতে যেমন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা সাহিত্যকে বোঝায়, শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু তেমন নয়। শিশুরা এই সাহিত্যের রচয়িতা নয়, পাঠক। তাই তাদের জন্য যাঁরা সাহিত্য রচনা করবেন তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি। ঠিক কেমনভাবে লিখলে তাদের মনের মতো হবে সেই কৌশলটি শিশুসাহিত্যিকের জানা চাই। এই শিশু-কিশোর সাহিত্য একই নাকি ভিন্ন ভিন্ন দুটি সাহিত্যধারা এবিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লীলা মজুমদার (১৯০৮- ২০০৭)। তাঁর মতে —

"ইংরেজীতে যখন বলা হয় বুকস্ ফর চিলড্রেন, কিংবা জুভেনাইল লিটারেচার, সকলেই বুঝে নেয়, ওইসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ

আপত্তি করেন, বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে কিশোর। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশুসাহিত্য বলতে ৫-১৬ পর্যন্ত সব পাঠকের কথাই মনে করি।"[৮]

বিভিন্নজনের নানান আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে শিশু ও কিশোর — এই উভয় বয়সের পাঠকদের উদ্দেশ্য করে যা কিছুরচিত হয়, সামগ্রিকভাবে তাকেই বলা হয় শিশু-কিশোর সাহিত্য। জীবনের প্রথম কয়েক বছর অর্থাৎ প্রায় ৫-৬ বছর পর্যন্ত শৈশবের সীমারেখা। এইসময় শিশু একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানান অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা কাটিয়ে ধীরে ধীরে বোধের জগতে উন্নীত হতে শুরু করে। এইসময়ে সে মা, ঠাকুমা এবং বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে ছড়া, গল্প, কবিতা, রূপকথা ইত্যাদি শোনে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯৬৩), 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৭), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৮৯৪), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১৮৫৯-১৯৩৯) 'টুকটুকে রামায়ণ' (১৯১০) ইত্যাদির মধ্যে শৈশবের এই স্বপ্নমাখা দিনগুলির ছবি ফুটে উঠেছে। এই ছড়াগুলি মাতৃকণ্ঠে থেকে শিশুকণ্ঠে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এর ফলে তার মনে সাহিত্যের রস সঞ্চারিত হয়। এরপর যখন সে আরো বড়ো হয় অর্থাৎ, যখন তার বয়স ৮-৯ থেকে ১৬-১৭ বছরের মধ্যে থাকে সেই সময়টি তার কৈশোরকাল। এই স্তরে দেখা যায় সে মন, বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি সব দিক থেকেই অনেক বেশি পরিণত। তাই এই দুই স্তরের সাহিত্যকে অনেকেই সমগোত্রীয় ভাবতে নারাজ। কিশোর বয়সের পাঠকদের জন্য রচিত সাহিত্যকে তাঁরা 'কিশোরসাহিত্য' বলার পক্ষপাতী। কৈশোরকালের পাঠক-পাঠিকার মনন ও বৌদ্ধিক স্তর শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক বেশি পরিণত হওয়ায় তারা আগের মতো রূপকথা, ছড়া, গল্প ইত্যাদি শুনে আর মুগ্ধ হতে পারে না। তখন বিভিন্ন রোমাঞ্চকর গল্প, উপন্যাস, অভিযান কাহিনি, শিকার কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প ইত্যাদি বিষয়ে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রেই শিশু এবং কিশোরদের জন্য আলাদা আলাদা সাহিত্য রচনা করা হয়। এই সাহিত্যের পরিধি এতটাই বৃহৎ ও ব্যাপক যে এই সাহিত্যকে কেবলমাত্র 'শিশুসাহিত্য' নামে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

একটি শিশু এবং একটি কিশোরের মনের জগৎ কখনোই একরকম হয়না। তাই তাদের জন্য লেখা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সাহিত্যিক শিশু এবং কিশোরদের জন্য আলাদা আলাদা সাহিত্য রচনা করেছেন। আবার অনেকের রচনায় একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সব বয়সের ছোটোদের ভালোলাগার বিষয়গুলি একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে অনেকক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের জন্য পৃথক সাহিত্য রচিত হলেও এই দুটি সাহিত্যে সবসময় পৃথক পৃথক সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। আধুনিক সময়ে রচিত অনেক সাহিত্য আছে যেগুলির ভোক্তা ঠিক শিশু ও কিশোরেরা না হলেও তারাও সমানভাবে এই সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ শৈলেন ঘোষ (১৮২৮-২০১৬), হরেন ঘটক (১৯০৪-১৯৯৩) প্রমুখের রচনার কথা বলা যেতে পারে। আবার শিশু ও কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট করে রচিত হলেও এমন অনেক রচনাই আছে যেগুলির বক্তব্য বা রস সবসময় শিশুমনের উপযোগী হয়না। যেমন সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) প্রমুখের সাহিত্য। এমন অনেক শিশু-কিশোরসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলির বক্তব্য ও রস শিশুদের সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলেও শ্রুতিমাধুর্য ও চিত্রময়তার গুণে সেগুলি তাদের ভালো লাগে। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'নালক' (১৯১৬), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' (১৯২১) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই সাধারণভাবে বলা যায় সাহিত্যের যে শাখায় শিশু ও কিশোরদের মনের মতো সমস্ত রচনাই স্থান পায় এবং শিশু-কিশোর মনের গণ্ডি পেরিয়ে সর্ব্ববয়সের পাঠক-পাঠিকার উপভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে তাকেই সর্ব্বতোভাবে শিশু-কিশোরসাহিত্য নামে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। লীলা মজুমদারের মতে — "... তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেসব ছোটোদের বই সমঝদার বয়স্কদের সমর্থন পায়না, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর শিশুসাহিত্য নয়। ছোটোদের ভালো বই বড়দের ভালো লাগা উচিত। সত্যি কথা বলতে কী, এইখানেই তাদের আসল পরীক্ষা, সহানুভূতিশীল বড়রাও তাদের ভালো বলেন কিনা। ছোটোদের অপরিণত বুদ্ধি সবসময়য় ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারেনা; তাদের কাছে যেটা ভালো লাগে, আসলে সেইটেই সবচেয়ে ভালো, এমন কোনো কথা নেই। অনেক খেলো জিনিসও তাদের ভালো লাগে; তাদের রুচির কোনো মানদণ্ডই তৈরি হয়নি। তবে একথাও সত্যি যে, বয়স্ক সমালোচকরা হাজার প্রশংসা করলেও, যে বই ছোটোদের আনন্দ দিতে পারেনা, রসের সভায় তাকে পাশ নম্বর দেওয়া যায়না।"[৯] তাই সামগ্রিকভাবে এই বিশেষ ধরনের সাহিত্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে, যেসব সাহিত্য পড়ে শিশু এবং কিশোরেরা আনন্দ পায়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শিক্ষা পায় এবং সর্বোপরি মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই সাহিত্যকে শিশু-কিশোর সাহিত্য বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে যেহেতু সমস্ত

© Santiniketan Sahityapath

ধরনের ছোটোদের সাহিত্যকেই একটি সময় পর্যন্ত ‘শিশুসাহিত্য’ বলা হয়েছে, সেকারণে কথাটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করা যেতেই পারে। শিশু এবং কিশোরদের জন্য লেখা হলেও এই সাহিত্যের অবদান সর্বজনীন। কেননা সব বয়সের পাঠকরাই এই সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে পারেন।

ছোটোদের জন্য লেখা সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলা হলেও বিষয়টি আদৌ শিশুসুলভ নয়। ‘শিশুসাহিত্য’ বলতে ঠিক কোন্ লেখাগুলিকে নির্বাচন করা হবে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে এবং বর্তমানেও হয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে শৈশব ও কৈশোর এতটাই কাছাকাছি যে কিশোরসাহিত্যের বিভিন্ন লেখাগুলিকেও শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসলে শৈশব এবং কৈশোর স্বপ্ন দেখার বয়স। আর শিশুসাহিত্য সেইসব স্বপ্ন দেখা মনের সাথী। যে-কোনো দেশেই ছোটোদের নিজস্ব জগত গড়ে দেওয়ার কারিগর হিসাবে শিশুসাহিত্যিকের ভূমিকা অনেকখানি। মনে রাখা প্রয়োজন তারা বয়সে ছোটো বলেই যে তাদের জীবনে কোনো সমস্যা নেই, জটিলতা নেই তা কিন্তু নয়। সদ্য বুলি ফোটার কিছুদিন পর থেকেই লেখাপড়া শুরু হয়ে যায়। বিকেলের সবুজ মাঠ হাতছানি দিলেও সে ডাকে সাড়া দেওয়া যায় না। তখন তাকে এক পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তুলতে সমাজ ও পরিবার বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখলেই হবে না, তার সঙ্গো যুক্ত হয় আঁকা, গান-বাজনা, নাচ, সাঁতার এবং আরো অনেক কিছু। এহেন পরিস্থিতিতে একজন শিশুসাহিত্যিককে নতুন করে গল্প বলার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাঁকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিশু সেই বিষয়টিকে অন্তরে ধারণ করতে পারে, তার সঙ্গো নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারে। বর্তমান সময়ে ‘হ্যারিপটার’ সিরিজের গল্পগুলি তাই শিশু ও কিশোর মহলে এত জনপ্রিয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘আইডেন্টিফাই’ করা, শিশুরা এই বিষয়গুলির সঙ্গো নিজেদেরকে সেভাবেই ‘আইডেন্টিফাই’ করতে পারে। সব থেকে বড়ো কথা হলো শিশুদের সাহিত্যিককে এমনভাবে লিখতে হবে যা পড়ে শিশুরা আনন্দ পাবে।

শৈশবের একেবারে অন্তর্লোকে আলো ফেলা সহজ কাজ নয়। শিশুমনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তারা নতুনত্বের অনুসন্ধানী। একই বিষয়ে লেখা জিনিস তাদের বারেবারে পড়তে ভালো লাগবে না। তাই তাদের জন্য লেখা ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি বিষয়গুলি বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হতে হবে। কেননা এই বৈচিত্র্যই হলো শিশুসাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান শর্ত। শিশুসাহিত্যের স্বরূপ ঠিক কেমন হওয়া উচিত সেবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর সম্পর্কে লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে ছোটদের বই হবে সবচেয়ে ভালো বিষয়ে লেখা, সবচেয়ে ভালো কাগজে ছাপা, সবচেয়ে সুন্দর ছবি ও অলঙ্করণ দিয়ে সাজানো এবং সবচেয়ে ভালো লেখা দিয়ে পুষ্ট।”[১০]

শিশুদের আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাঁদের লেখা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিশুর কোমল মনে যে শিক্ষা ও আদর্শের বার্তা পৌঁছায়, তা অজান্তেই আজীবন ছাপ রেখে যায়। পরবর্তীকালে সে যখন একটু একটু করে বড়ো হয় তখন তার ভাবনাচিন্তা এবং রুচিবোধের উপর তা গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু অতীতে এবং বর্তমানে শিশুসাহিত্যের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে ও পাচ্ছে যেগুলি কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। এই রুচিবোধের প্রসঙ্গো আলোচনা করতে গিয়ে সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) তাঁর ‘শিশুসাহিত্যে সুরুচি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন —

“... ছোটোদের জন্য লিখিত বইয়ের বিষয়েও কোনো কোনো স্থানে রুচির অভাব দেখা যায়। সময়ে সময়ে এমন বিষয়ে গল্প লেখা হয় যাহা শিশু ছাড়িয়া বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীর পক্ষেও অনুপযুক্ত। আমাদের দেশের সেকালের রূপকথাগুলির একটি মস্ত দোষ এই যে, সৎমা বা সপত্নীর অসদব্যবহার চিত্রিত না করিলে যেন সেগুলি সম্পূর্ণ হইত না। এই অসদব্যবহারের ফলে দোষীকে যে হেঁটে কাঁটার উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতিয়া ফেলার নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগ করিতে হইত, সেই শাস্তির কথা শুনিয়া অনেক কোমলমতি বালক-বালিকার প্রাণ যে শিহরিয়া উঠে, তাহা আমি জানি।”[১১]

আবার পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিশুসাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন — “বিদেশি রূপকথায় তেমনি গল্পের বিষয় সাধারণত নায়ক-নায়িকার প্রেম ও তাহাদের বিবাহ। বিবাহ মানুষের জীবনের একটি প্রধান ব্যাপার, কিন্তু সেই কথাটি বালক-বালিকার মনে অকালে ঢুকাইয়া না দেওয়াই ভালো।... ছোটোদের গল্পে যুবক-যুবতীর প্রেম অপেক্ষা পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, মাতৃস্নেহ, ভাইবোনের ভালোবাসা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি প্রেমের অন্য রূপই বড়ো করিয়া দেখান ভালো।”[১২]

© Santiniketan Sahityapath

এই কারণেই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনে ছোটোরা খুব খুশি হয়। সীতা কিংবা দ্রৌপদীর পতিভক্তি পরায়ণতার ছবি অপেক্ষারাম ও লক্ষ্মণের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, বীরত্ব, মহাভারতের পঞ্চপান্ডবদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনি তাদের বেশি আকর্ষণ করে।

শিশুসাহিত্যে সুনীতি কিংবা সুরুচির পাশাপাশি ভাষার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশুসাহিত্য শিশুরা রচনা করে না, বড়োরাই করেন। কিন্তু শিশুদের জন্য লিখতে গিয়ে শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে কোনো শিশুসুলভ মানসিকতা স্থান পায় না। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের বয়স, তাদের অভিজ্ঞতা এবং রুচিই শিশুসাহিত্যে ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে দেখা যায় এইসব মানসিকতার কারণে বিগত প্রায় দুশো বছর ধরে শিশু এবং কিশোরদের জন্য রচিত অনেক সাহিত্যই শিশু-কিশোরদের জন্য অনুপযুক্ত। একথা ঠিক যে পৃথিবীর কোনো সাহিত্যই প্রথমদিকে শিশুদের কথা ভেবে লেখা হয়নি বরং সর্ববয়সের পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা ভেবে রচিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব সাহিত্যের মধ্যে অনেকগুলিই পরবর্তীতে শিশুপাঠ্য সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সচেতনভাবে শিশুদেরকে উদ্দেশ্য করেই আলাদাভাবে সাহিত্য রচনা শুরু হলো তখন তার মধ্যে সুরুচির দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। শিশুসাহিত্যের স্বরূপ ও ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন —

"অনেকের মত যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সম্বন্ধে — অর্থাৎ আর্ট সম্বন্ধে — নীতিবাদ খাটে না। অভিপ্রায়মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কোনও নীতির প্রচারের অভপ্রায়ে, মানুষকে ভালো হইবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া যা লিখিত তাহা আর্ট নয়। যাহা সুন্দর এবং আনন্দ দেয় তাহাই আর্ট। এ কথা মানিয়াও কিন্তু বলিতে হয় যে, এক জিনিষই সকলের কাছে সমান সুন্দর এবং মধুর না-ও লাগিতে পারে। ফুলের নির্ম্মলতা, সৌন্দর্য এবং সৌরভ সকল মানুষকে সমান আনন্দ দেয় না। মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে থাকে তাহার রুচি। এই রুচিকেই সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত ও বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক।... সুরুচির পথে সুনীতি এবং সুনীতির সহিত যাহা সত্য, যাহা সুন্দর এবং যাহা শুভ তাহাই আমাদের তরুণ সমাজকে গৌরবান্বিত করুক।"[১৩]

প্রবন্ধটির শেষে প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) একটি মন্তব্য সংযোজিত হয়েছিল। মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য —

"... অনেক শিশুপাঠ্য পুস্তকে ও মাসিকপত্রে এমন সব ভূতের গল্প ও ছবি থাকে, যাহাতে পাঠক-পাঠিকারা ভয় পায়। ভূত আছে কি নাই, তাহার আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।... যদি ভূতের গল্প একান্তই কেউ দিতে চান, গল্প ও ছবি এমন দিবেন, যাহা দ্বারা ভূতগুলো হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো কিছু হয়।"[১৪]

অলৌকিক ও অবাস্তব ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পে সরলমতি শিশুদের মনে ভয়বোধ ও শিথিলতার জন্ম হতে পারে। তাই ভূত মানেই যে ভয় সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে হাস্যরসাত্মক ভাবে ভূতের গল্প পরিবেশন করলে তা শিশুদের মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটাতে পারে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) এই ধারার এক অনবদ্য পথিকৃৎ। তাঁর বিভিন্ন ভূতের গল্প ও উপন্যাসে ভূতেদের এমন সব ছবি ধরা পড়েছে যেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই, সমস্তটাই হাস্যরসে নির্মল উঠেছে।

শিশুসাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরা শিশু নন। বয়স, মেধা ও অভিজ্ঞতায় তাঁরা অনেক এগিয়ে। তাই শিশুদের জন্য লিখতে হলে তাদেরই একজন হয়ে উঠতে হবে। শিশুসাহিত্যের ভাষাকে হতে হবে সরল ও ভারহীন। শিশুসাহিত্যের বিষয় নির্বাচন সবথেকে কঠিন কাজ। এই বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুসাহিত্যের ভাষা। শিশুরা সব থেকে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ। যে-সমস্ত কাহিনির মধ্যে তারা নিজেদেরকে একাত্ম করে দেখতে পায়, নিজেরাই সেই কাহিনির এক একটি চরিত্র হয়ে ওঠে, যেখানে কল্পনার অবাধ স্বাধীনতা থাকে, সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তবের কোনো সীমারেখা থাকেনা সেইসব গল্প-কাহিনিগুলি তারা মন দিয়ে গ্রহণ করে। অদ্ভুত রসের নানান ছড়া, গল্প, ফ্যান্টাসি, রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনি ইত্যাদি তাদের ভালো লাগে। এই ধরনের ছড়া, গল্প, কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করে তারা তাদের বাস্তব ইহজাগতিক পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করে নিজেদের এক কল্পনাজগৎ তৈরি করে নেয়। তাই ছোটোদের জন্য যাঁরা লেখার দায়িত্ব নেবেন তাঁদেরকেও প্রথমে সেই জগতের বাসিন্দা হতে হয়।

© Santiniketan Sahityapath

কিন্তু সব শিশু একরকম হয় না। একই বয়সের বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। একটি বয়স পেরিয়ে আর এক বয়সে যেতে যেতে সে শুয়োপোকার মতো খোলস ছেড়ে প্রজাপতি হয়ে উঠতে থাকে। পিতামাতার স্নেহ, ভালোবাসা, পারিবারিক শিক্ষা, আবহাওয়া ও পরিবেশগত প্রভাব তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সব শিশু যেমন একরকম হয় না, সমস্ত শিশুসাহিত্যিকও তেমনি একইরকম হতে পারেন না। কোনো একজনের কলমে যদি ভাষার জাদুদণ্ড থাকে অপরজনের কলমে ফুটে ওঠে কল্পনার মহাপ্রাসাদ। আর এই দুইই যখন একের লেখনীতে এসে মিলে যায় তখন তা এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত নির্মাণ করে। তাই একজন শিশুসাহিত্যিকের দায়িত্ব অন্যান্য সাহিত্যিকের থেকে অনেকগুণ বেশি।

সাহিত্যের সঙ্গো শিক্ষার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। বৃহত্তর দিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক জনগণকে শিক্ষা দিতে চান। ছোটোদের জন্য লিখিত সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। শিশুশিক্ষা এবং শিশুসাহিত্য একে অন্যের সঙ্গো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। শিশুসাহিত্যের একেবারে সূচনালগ্নে আনন্দের উপকরণ তেমনভাবে ছিল না। শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে তাদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই সেইসময়কার গ্রন্থগুলি রচনা করা হতো। ধীরে ধীরে যত সময় এগিয়েছে ততই লক্ষ করা গেছে শিশুদের শিক্ষা এবং শিশুদের সাহিত্যের মধ্যে একটু একটু করে পার্থক্য তৈরি হতে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। তবে প্রথমদিকে একমাত্র শিক্ষার দিকটিকেই সর্বাগ্রে রাখা হতো, পরে তার মধ্যে আনন্দের নানান উপকরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আনন্দকে পুরোভাগে রেখে শিক্ষা দেওয়া আধুনিক শিশুসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গো শিক্ষার আদৌ কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা সেবিষয়ে অনেকের মধ্যেই মতানৈক্য আছে। এ-প্রসঙ্গো প্রমথ চৌধুরীর অভিমত —

"প্রথমতঃ, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, স্বচ্ছন্দে পান করে; কেন না শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয় — একথা সকলেই জানেন।"[১৫]

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা ও সাহিত্য — এই দুইয়ের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা। কিন্তু শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি ভিন্ন বস্তুকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিন্ন করে দেখা হয়। ছোটোরা যেহেতু একেবারেই নতুন, সমাজ, জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ — সেকারণে তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে সেখানে নীতি-উপদেশের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই নীতি-উপদেশ যদি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র হয় তবে তা তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারে না। তাই শিশুসাহিত্যে নীতি-উপদেশ থাকলেও তাকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, তা যেন তাদের মনে অনন্দের সঞ্চার করার পাশাপাশি তাকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলতে পারে। ছোটোদের সাহিত্যের এই স্বরূপ প্রসঙ্গো কবি ও প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৮) বলেছেন — "আমাদের সকলেরই আজ এ কথা উপলব্ধি করা দরকার যে, শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সাহিত্যকে অভিন্ন করে না তুলতে পারলে, শিক্ষাও হবে অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্যও হবে পঙ্গু। এই শিক্ষার মানে 'সদা সত্য কথা কহিবে' এবং 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। এ শিক্ষার মানে শিশু মনে যতগুলি সদবৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা।"[১৬]

কিন্তু অনেক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুসাহিত্যিক এই শিক্ষা ও আনন্দের সীমারেখাকে ছাড়িয়ে যান। ফলস্বরূপ সেইসব বই পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি অতিক্রম করে 'সাহিত্য'এ উপনীত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গো লীলা মজুমদারের অভিমত —

"একদল লোক আছেন যাঁদের ধারণা ছোটোদের বই মাত্রই শিক্ষাপ্রদ হবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, পড়বামাত্রই ছোটোরা নতুন কিছু শিখে নেবে, কিংবা কী করে ভালো ছেলে হতে হয় বুঝে নেবে। তাঁরা বলেন, এই শিখে নেওয়া ও বুঝে নেওয়াটা যদি আনন্দের মধ্য দিয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। অর্থাৎ, শিক্ষাটাই হ'ল বড় কথা, রসের দরকার হয় শুধু পাঁচনটাকে গেলাবার জন্য... সত্যিকার কোনো শিল্পরচনার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু রূপকথার সোনার কাঠির মতো, যাতেই তার ছোঁয়া লাগে সে-ই সোনার হয়ে যায়।"[১৭]

শিক্ষার সঙ্গো সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবিষয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর মতে —

"আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না।

স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক। নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা বালক থাকিয়া যায়।"[১৮]

কোনো কিছু আনন্দের সঙ্গো পড়লে, তা পাঠ্যবিষয়ের গ্রহণশক্তি বা ধারণশক্তিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে চিন্তা ও চেতনার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে। তাই বাড়ির ছোটোদের হাতে ভালো ভালো বই তুলে দেওয়ার কর্তব্য বড়োদের। কেননা সাহিত্যই সেই মাধ্যম, যার দ্বারা তাদের চরিত্র গঠিত হবে। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ সেই সম্পর্কে বিচারবোধ তৈরি হবে। পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি অতিক্রম করে অতিরিক্ত কিছু জানার উপায় হলো সাহিত্য। ছোটোদের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কতকগুলি শর্ত আছে। এই শর্তগুলির মধ্যে প্রথমেই আসে শিশুসাহিত্যের ভাষাগত দিকটির কথা। শিশুসাহিত্যের ভাষা হতে হবে সহজ-সরল ও নির্ভার। ভাষা সহজ-সরল না হলে তা ছোটোদের বোধগম্য হবে না। দ্বিতীয়ত, শিশুসাহিত্যের বিষয় হবে আকর্ষণীয়। কেননা, শিশুরা নীতি-উপদেশ ভালোবাসে না। সবসময়েই তারা এই ধরনের জটিল ও গুরুগম্ভীর বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকতে চায়। তাই তাদের জন্য লিখতে গেলে রচনার বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হয়। আকর্ষণীয় হলে তবেই তাদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটবে। ভাষা সহজ ও আকর্ষণীয় হওয়ার পাশাপাশি অর্থপূর্ণও হতে হবে। ছোটোরা জটিল বিষয়ের ব্যাঞ্জনা বোঝে না ঠিকই, তবে তারা একেবারে অবুঝও নয়। তাই তাদের জন্য লিখিত সাহিত্যে এমন কিছু ইঙ্গিত ও বার্তা থাকবে যেগুলি অজান্তেই তাদের মনে গভীর ছায়াপাত ঘটাবে, তাদেরকে ভাবতে শেখাবে। এবিষয়ে সুখলতা রাও লিখেছেন — "শিশুসাহিত্যের ভিতর দিয়া শিশুর সরল মনে যে ছবি, যে শিক্ষা, যে আদর্শ পৌঁছায়, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষাদীক্ষা, এমনকি রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করে।"[১৯]

শিশুসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতির এই সারল্য শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজ করে লিখতে চাইলেই সবসময়য় সহজ করে লেখা যায়না। এই সরলতার দিকটি লেখকের গভীর জীবনবোধের উপর নির্ভর করে। কীভাবে লিখলে ঠিক ছোটোদের মনের মতো হবে, কীভাবে বললে ঠিক তাদের মনের মতো করেই বলা হবে — এই বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করার জন্য লেখককে রীতিমতো অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই সরলতার গুণটিকে অকৃত্রিমভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) প্রমুখের রচনার মধ্যে। সহজ করে কোনোকিছু প্রকাশ করা যে কত কঠিন এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। 'খাপছাড়া' গ্রন্থে তিনি বলেছেন —

"সহজ কথায় লিখতে মোরে কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।" [খাপছাড়া ১৯৩৭]

সমগ্র সাহিত্য তথা শিশুসাহিত্যে এই সরলতাই হলো সব থেকে বড়োগুণ। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিশুসাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে এই সরলতার সন্ধান করেছেন। বাংলা সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের পাশাপাশি শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫), তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬) প্রমুখের রচনারীতি যেমন সহজ তেমনি আন্তরিক। ছোটোদের প্রতি এই আন্তরিকতাই এই সাহিত্যকে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

ছোটোদের মনে কৌতূহল ধরে রাখার জন্য সহজ-সরল আঙ্গিকের পাশাপাশি আরো বেশ কিছু উপাদান আছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ঘটনা পরম্পরার বিস্তার। একটি ঘটনা চলাকালীন আর একটি ঘটনার সূত্র রচিত হয়ে যায়। এই ঘটনা পরম্পরার কৌতূহলোদ্দীপক বিস্তার ঘটিয়ে লেখক পাঠকদের মনকে সজাগ ও সচকিত করে তোলেন। রূপকথার গল্পে একদিকে যেমন ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্কস ও নানা রকমের অশুভ শক্তির আনাগোনা — তার বিপরীতেই থাকে রাজা ও রাজপুত্রদের বীরত্ব ও জয়লাভের কাহিনি। রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানোদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে সরলমতি পাঠক ও শ্রোতাদের মনে ভয়বোধের উদ্ভব

 © Santiniketan Sahityapath

ঘটলেও তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। কেননা এই সমস্ত অনাচারের অবসান ঘটানোর জন্য আছে রাজা ও রাজপুত্রেরা। তাদের এই জয়লাভে তারা আনন্দ পায়, আপ্লুত হয়ে ওঠে। নিজেদের অজান্তেই তারা সাহসী ও পরাক্রমশালী রাজপুত্রদের সঙ্গো নিজেদের একাত্ম করে ফেলে। এই একাত্মীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন তারা বিষয়টির একেবারে গভীরে গিয়ে এর রস আস্বাদনে সক্ষম হয়। আর এই আগ্রহ নিহিত থাকে ঘটনা ও কাহিনি পরম্পরার কৌতূহলোদ্দীপক বিস্তারের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে শিশুমন সততই জিজ্ঞাসু ও কল্পনাপ্রবণ। এই জিজ্ঞাসা ও কল্পনাকে ত্বরান্বিত করাই হলো সাহিত্যের কাজ। তবে শিশুসাহিত্যের বিষয় নির্বাচনের দিকটিকে গভীরভাবে ভাবতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় সহজ-সরল এবং কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলতে গিয়ে লেখক কেবলমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনের দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে মূল কাহিনির চরিত্রগুলি মজাদার হয় বটে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে বিশেষ কোনো আদর্শ ও বার্তা শিশুমনের কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু শিশুসাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা হাসি-মজার মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন ও কঠোর সত্যগুলিকেও পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। তাই ছোটোদের সাহিত্যকে হতেই হবে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। কেবলমাত্র হাসি, মজা ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে মন ভুলিয়েই এই সাহিত্যের আবেদন শেষ হয়ে যায়না। এই সাহিত্য রচনার পিছনে কাজ করে সুগভীর দায়িত্ববোধ। হাসি, মজা দিয়ে তাদের মন ভোলানো যায় ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে ভাবতে শেখানো যায়না। হাসি, মজা ও বিনোদন অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তাকে সমাজ, জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন করে তোলার প্রয়াস শিশুসাহিত্যে বিদ্যমান থাকে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' (১৯৬৪), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' (১৯০৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নানান কবিতা ও ছড়ায় হাসি মজা ও বিনোদন থাকলেও জীবনসত্যের বাস্তব সত্যগুলিকে অস্বীকার করা হয়নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) সমগ্রভাবে শিশুসাহিত্য না হলেও এর অন্তর্গত 'আম আঁটির ভেঁপু', লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখীর পালক' (১৯৫৭), 'ঘোতন কোথায়' (১৯৪৮), 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' (১৯৫৩), খগেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৮৯৬-১৯৭৮) 'ভোম্বল সর্দার' (১৯৩৬) ইত্যাদি রচনাগুলি সহজ-সরল রচনারীতির মধ্য দিয়ে গভীর জীবনসত্যের সন্ধান দিয়েছে। এছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬), তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গো ছোটোদের নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন। ছোটোদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের পথে রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যধারাকেও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

ছোটোরাই আগামীদিনের সুনাগরিক ও পথপ্রদর্শক। তাই তাদের সফল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সাহিত্যের একটি নিজস্ব আঙ্গিক ও প্রকরণ থাকবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছোটোদের মন সততই চঞ্চল ও কল্পনাবিলাসী। এই কল্পনায় ভর করে সে জগত ও জীবনের সমস্ত রহস্য অনুধাবন করতে চায়। সাহিত্যই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা তাদের কল্পনাবিলাসী মন ডানা মেলে উড়তে পারে। বড়োদের মতো তাদেরও একটি নির্দিষ্ট জগত আছে, যে জগতের একচ্ছত্র অধিপতি তারাই। যথার্থ সাহিত্য তাদের সেই জগতে আলো ফেলে সেই জগতের চিত্র অঙ্কন করে। তাই প্রকৃত শিশুসাহিত্যের মধ্যে শিশুরা খুঁজে পায় তাদের সেই নিজস্ব জগতের আনন্দ। তাদের সেই জগতের একটা আলাদা নিয়মকানুন আছে, যা বড়োদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেকারণেই মানুষের জীবনে শৈশব ও কৈশোরকাল এত আনন্দের, এত বিস্ময়ের। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায়, যে সাহিত্য পড়ে শিশু ও কিশোরেরা আনন্দ পায়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নৈতিক শিক্ষা লাভ করে, সেই সাহিত্যকে শিশু-কিশোর সাহিত্য বলা যেতে পারে। যে-কোনো ভালো সাহিত্যে তারা হাসি, মজা ও বিনোদনের আড়ালে জগৎ, জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানান তথ্য জানতে পারে। এগুলিই তাদের বৌদ্ধিক ও চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু এগুলি পরিবেশনের সময় লক্ষ রাখতে হবে এগুলি যেন আনন্দকে বাদ দিয়ে কেবল উপদেশাত্মক না হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আনন্দকে পুরোভাগে রেখে বিষয়গুলিকে পরিবেশন করতে হবে। শিবরাম চক্রবর্তীর কাঞ্চন ('বাড়ি থেকে পালিয়ে'), খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল ('ভোম্বল সর্দার'), সত্যজিৎ রায়ের ফটিকচাঁদ ('ফটিকচাঁদ') ইত্যাদি চরিত্রগুলি এভাবেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে জীবনের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

তাই কেবলমাত্র বিনোদন কিংবা আনন্দদানই এই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই সাহিত্যের লক্ষ আরো ব্যাপক। ছোটোরাই আগামীর প্রতিনিধি। সমাজের সমস্ত ভালো ও ইতিবাচক বিষয়গুলিকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু তাদের জন্য লিখতে বসে তাদেরকে নিছক ছোটো বলে গণ্য করা উচিত নয়। সমস্ত ভালোটুকু তাদের কাছে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, তারা যেন সেগুলিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' প্রবন্ধে বলেছেন — "আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের চটুল ও লঘু বিষয়ের সন্নিবেশে লেখা বইগুলির প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে একটা সময়ের পর ছেলেদের হাতে সমস্ত ধরনের বইই তুলে দেওয়া দরকার। তার মধ্যে তারা কিছু বুঝবে, কিছু বুঝবেনা। এভাবেই তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ তৈরি হবে। বর্তমানে শিশু-কিশোর সাহিত্যের নামে এমনকিছু সাহিত্যও লেখা হচ্ছে যেগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যহীন হাসি, মজা ও চটক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনসত্যের গভীরতার কোনো নিদর্শন সেগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। এগুলি শিশু-কিশোরদের মনে সাময়িক আনন্দের সঞ্চার ঘটালেও পরবর্তীতে কোনো ছাপ রেখে যেতে পারে না। এছাড়াও এগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি বিভ্রান্তির ছবিও দেখতে পাওয়া যায় যা তাদেরকে বিপথগামী করে তুলতে পারে। এখানেই ছোটোদের সাহিত্য ও বড়োদের সাহিত্যের পার্থক্য। বড়োরা তাঁদের নিজেদের চিন্তা, চেতনা ও রুচিবোধের দ্বারা যেকোনো সাহিত্যের ভালো-মন্দের বিচার করতে পারেন। কিন্তু ছোটোরা তা করতে সক্ষম নয়। তাই তাদেরকে সঠিক পথে চালনা করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের এবং বাড়ির বড়োদের। যথার্থ ও চিরায়ত শিশু-কিশোর সাহিত্য সেগুলিই যেগুলি শিশু-কিশোরদের ভালোলাগার গণ্ডি অতিক্রম করে সর্ব বয়সের পাঠকের আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে শিশু-কিশোর সাহিত্য সর্ববয়সের পাঠকদের উপভোগ্য হলেও যেকোনো সাহিত্য শিশু-কিশোরদের উপভোগের বিষয় নয়। অনেকেই 'শিশুসাহিত্য' ও 'শিশুশিক্ষা'— এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখার পক্ষপাতী। কিন্তু শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিশুশিক্ষাকে আলাদা করে দেখা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। শিশুসাহিত্যকে একদিকে আনন্দ এবং অন্যদিকে শিক্ষার পরিপন্থী করে গড়ে তুলতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বেরিয়ে অতিরিক্ত সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে তা লাভ করা সম্ভব। ছোটোদের নৈতিক চরিত্র গঠনেও সাহিত্যের ভূমিকা অপরিহার্য। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি নিয়ে সমাজে যেসব বৈষম্য প্রচলিত হয়ে আছে যথার্থ সাহিত্যই পারে সেগুলিকে ছোটোদের মন থেকে দূরীভূত করতে। এগুলি ছাড়াও সমাজে প্রচলিত কিছু অন্ধ কুসংস্কার, যেগুলি বদ্ধমূল জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকে চেপে বসে আছে সেসম্পর্কেও সাহিত্য ছোটোদের সচেতন করে তুলতে পারে। প্রথমে নিজেকে, নিজের পরিবারের মানুষজন ও নিজের চতুর্দিকের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠার পর ধীরে ধীরে সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজগতের নানান খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই মানবজীবনের সূচনা থেকেই সাহিত্যের ভূমিকা অপরিহার্য। জমির উর্বরতাশক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য যেমন জল, হাওয়া, রৌদ্র ইত্যাদির প্রয়োজন, একটি শিশুর প্রাথমিক বিকাশেও তেমনি সাহিত্যের ভূমিকা অপরিহার্য।

তাই ছোটোদের পরিপূর্ণ মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে সাহিত্যের থেকে শক্তিশালী মাধ্যম আর একটিও নেই। যারা ভবিষ্যতের পথিকৃৎ তাদের মানসিক অগ্রগতির সূচনালগ্নে তাদের রসবোধ, রুচিবোধ ইত্যাদির মানদণ্ড তৈরি করে দেওয়ার উপকরণ সাজিয়ে দেয় শিশু-কিশোর সাহিত্য। শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যেও তাই নানান বৈচিত্র্যের সমাহার লক্ষ করা যায়। রূপকথার গল্প, পশুপাখির গল্প, নানান ঐতিহাসিক বীরের বীরত্বগাথা, মনীষীদের জীবনী, ভূতের গল্প, নানান রহস্য-রোমাঞ্চকর গল্প, অভিযান কাহিনি, খেলাধুলো বিষয়ক গল্পের পাশাপাশি ইতিহাস-ভূগোল ও বিজ্ঞানের নানান গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার লক্ষ করা যায় শিশু-কিশোর সাহিত্যে। আর এই বিষয়গুলিকে পরিবেশন করা হয় সহজ-সরল ভাষায় ও দৃষ্টিনন্দন ছবির সমাহারে। তবে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা ইত্যাদি বিষয়গুলির স্থান শিশুসাহিত্যে নেই। এগুলি শিশু-কিশোর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই বিষয়গুলি শিশু-কিশোর সাহিত্যে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যসূত্র:

১। ‘শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ’, ‘শিশুমন’, রমেশ দাস, কলকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬

২। ‘বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ’ (১৮০০-১৯০০)’, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৬৬, পৃ. ১

৩। ‘শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১৮১৮-১৯১৮’, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ‘ভূমিকা-ছ’

৪। ‘মুকুল’, ‘প্রস্তাবনা’, দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৯৩ জুন-জুলাই)

৫। ‘শিশুসাহিত্য’, প্রমথ চৌধুরী, ‘সবুজ পাতা’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন নাথ সম্পাদিত, কলকাতা, শিশু কিশোর আকাদেমি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩, পৃ. ২

৬। তদেব, পৃ. ২

৭। তদেব, পৃ. ৩

৮। ‘ছোটদের জন্য বই’, লীলা মজুমদার, ‘দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন’, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৪২

৯। ‘রায়বাড়ি’, ‘সুকুমার রায়’, লীলা মজুমদার, কলকাতা, বিচিত্রা গ্রন্থন বিভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০২৩, পৃ. ৯৩

১০। ‘ছোটদের বই’, লীলা মজুমদার, ‘উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী: জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা’, অনুবাদক সৈয়দ কওসর জামাল, মূলগ্রন্থের প্রকাশ ১৯৮৬, অনুবাদ ১৯৯৩, ইন্ডিয়া, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লি, পৃ. ৩৯

১১। ‘শিশুসাহিত্যে সুরুচি’, সুখলতা রাও, ‘সবুজ পাতা’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন নাথ সম্পাদিত, শিশু কিশোর আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪

১২। তদেব, পৃ. ৪

১৩। ‘সাহিত্য ও সুনীতি’, কামিনী রায়, প্রবাসী, ১ম সংখ্যা, ৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড, কার্তিক ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮

১৪। ‘শিশুসাহিত্যে সুরুচি’, সুখলতা রাও, ‘সবুজ পাতা’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন নাথ সম্পাদিত শিশু কিশোর আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪

১৫। ‘সাহিত্যে খেলা’, বীরবল, ‘সবুজপত্র’, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৫৯

১৬। ‘শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্য’, ‘প্রবন্ধগুচ্ছ’, অজিত দত্ত, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ২২৫-২৬

১৭। ‘রায়বাড়ি’, ‘সুকুমার রায়’, লীলা মজুমদার, কলকাতা, বিচিত্রা গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০২৩, পৃ. ১২১

১৮। ‘শিক্ষা’, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ (দ্বাদশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০০, পৃ. ২৭৮

১৯। ‘শিশুসাহিত্যে সুরুচি’, সুখলতা রাও, ‘সবুজ পাতা’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন নাথ সম্পাদিত, শিশু কিশোর আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪

২০। ‘জীবনস্মৃতি’, ‘ঘরের পড়া’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ. ৭১

—

Prantik Gabeshana Patrika